বৃহচ্চঞ্চু

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে তাঁর আপিসের যেখানে বসে তুলসীবাবু কাজ করেন, তার পাশেই জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশে অনেকখানি দেখা যায়। সেই আকাশে এক বর্ষাকালের সকালে যখন জোড়া রামধনু দেখা দিল, ঠিক তখনই তুলসীবাবুর পাশের টেবিলে বসা জগন্ময় দত্ত পানের পিক ফেলতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আকাশে চোখ পড়াতে ভদ্রলোক 'বাঃ' বলে তুলসীবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখে যান মশাই, এ জিনিস ডেইলি দেখবেন না।'

তুলসীবাবু উঠে গিয়ে আকাশপানে চেয়ে বললেন, 'কিসের কথা বলছেন?'

'কেন, ডবল রেনবো!' অবাক হয়ে বললেন জগন্ময়বাবু। 'আপনি কি কালার ব্লাইণ্ড নাকি মশাই?'

তুলসীবাবু জায়গায় ফিরে এলেন। —'এ জিনিসও কাজ ফেলে উঠে গিয়ে দেখতে হবে? একটার জায়গায় দুটো কেন, পঁচিশটা রামধনু উঠলেও তাতে আশ্চর্যের কী আছে জানি না মশাই। লোয়ার সারকুলার রোডে জোড়া গির্জা আছে তো; তাহলে তো তার সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।'

অবাক হবার ক্ষমতাটা সকলের সমান থাকে না ঠিকই, কিন্তু তুলসীবাবুর মধ্যে আদৌ আছে কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 'আশ্চর্য' বিশেষণটা তিনি কেবল একটি ব্যাপারেই প্রয়োগ করেন; সেটা হল মনসুরের দোকানের মোগলাই পরোটা আর কাবাব। অবিশ্যি সে খবরটা তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু প্রদ্যোতবাবু ছাড়া আর কেউ জানেন না।

এমনিধারা লোক বলেই হয়ত দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলে কবিরাজী গাছগাছড়া খুঁজতে গিয়ে একটা অতিকায় ডিমের সন্ধান পেয়েও তুলসীবাবু অবাক হলেন না।

কবিরাজীটা তুলসীবাবু ধরেছেন বছর পনেরো হল। বাবা ত্রৈলোক্য সেন ছিলেন নাম-করা কবিরাজ। তুলসীবাবুর আসল রোজগার আরবাথনট কোম্পানীর মধ্যপদস্থ কর্মচারী হিসেবে। কিন্তু পৈতৃক পেশাটাকে তিনি সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। সম্প্রতি ঝোঁকটা একটু বেড়েছে, কারণ কলকাতার দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ওষুধে আরাম পাওয়ার ফলে তিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এবারে দণ্ডকারণ্যে আসার পিছনেও ছিল কবিরাজী। জগদলপুরের মাইল ত্রিশেক উত্তরে এক পাহাড়ের গুহায় এক সাধু বাস করেন। তাঁর সন্ধানে নাকি আশ্চর্য ভালো কবিরাজী ওষুধ আছে এ খবর তুলসীবাবু কাগজে পড়েছেন। বিশেষত রক্তের চাপ কমানোর জন্য একটা ওষুধ আছে যেটা নাকি সর্পগন্ধার চেয়েও ভালো। তুলসীবাবু মাঝে মাঝে ব্লাডপ্রেসারে ভোগেন। সর্পগন্ধায় বিশেষ কাজ দেয়নি, আর অ্যালোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি তিনি মানেন না।

এই অভিযানে তুলসীবাবুর সঙ্গে আছেন প্রদ্যোতবাবু। তুলসীবাবুর বিস্ময়বোধের অভাবে প্রদ্যোতবাবুর যে ধৈর্যচ্যুতি হয় না তা নয়। একদিন তো তিনি বলেই বসলেন, 'মশাই, কল্পনাশক্তি থাকলে মানুষে কোনো কোনো ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারে না। আপনি চোখের সামনে ভূত দেখলেও বলবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে।' তুলসীবাবু শান্ত ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'অবাক না হলে অবাক হবার ভান করাটা আমার কাছে অদিখ্যেতা বলে মনে হয়। ওটা আমি পছন্দ করি না।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'জনের পরস্পরের প্রতি একটা টান ছিল।

জগদলপুরের একটা হোটেলে আগে থেকে ঘর ঠিক করে নবমীর দিন গিয়ে হাজির হলেন দুই বন্ধু। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ মেলে বিজয়নগরম, সেখান থেকে আবার ট্রেন বদলে জগদলপুর। মাদ্রাজ মেলের থ্রি-টিয়ার কামরায় দুটি বিদেশী ছোকরা উঠেছিল, তারা নাকি সুইডেনের অধিবাসী। তাদের মধ্যে একজন এত ঢ্যাঙা যে তার মাথা কামরার সিলিং-এ ঠেকে যায়। প্রদ্যোতবাবু হাইট জিগ্যেস করাতে ছোকরাটি বলল, 'টু মিটারস অ্যান্ড সিক্স সেন্টিমিটারস।' অর্থাৎ প্রায় সাত ফুট। প্রদ্যোতবাবু বাকি পথ এই তরুণ দানবটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেননি। তুলসীবাবু কিন্তু অবাক হননি। তাঁর মতে ওদের ডায়েটে এমন হওয়াটা নাকি কিছুই আশ্চর্যের না।

প্রায় মাইল খানেক পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে শ' পাঁচেক ফুট পাহাড় উঠে তবে ধুমাইবাবার গুহায় পৌঁছতে হয়। বিশাল গুহা, দশ পা ভিতরে গেলেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেটা যে শুধু ধুমাইবাবার ধুনুচির ধোঁয়ার জন্য তা নয়; এমনিতেই গুহায় আলো প্রবেশ করে না বললেই চলে। প্রদ্যোতবাবু অপার বিস্ময়ে দেখছিলেন গুহার সর্বত্র স্ট্যাল্যাকটাইট-স্ট্যাল্যাগমাইটের ছড়াছড়ি।

তুলসীবাবুর দৃষ্টি সেদিকে নেই, কারণ তাঁর লক্ষ্য কবিরাজী ওষুধ। ধুমাইবাবা যে গাছের কথা বললেন তার নাম চক্রপর্ণ।এনাম তুলসীবাবু কোনোদিন শোনেননি বা পড়েননি। গাছ নয়, গাছড়া—আর সে গাছড়া নাকি কেবল দণ্ডকারণ্যের একটি বিশেষ জায়গায় ছাড়া আর কোথাও নেই, আর সেই জায়গাটারও একটা বিশেষত্ব আছে সেটা তুলসীবাবু নাকি গেলেই বুঝতে পারবেন। কী বিশেষত্ব সেটা আর বাবাজী ভাঙলেন না। তবে কোন পথে কী ভাবে সেখানে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

গুহা থেকে বেরিয়েই গাছের সন্ধানে রওনা দিলেন তুলসীবাবু। প্রদ্যোতবাবুর সঙ্গ দিতে কোনো আপত্তি নেই ; তিনি নিজে এককালে শিকারের ধান্দায় অনেক পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন। বন্যপশু সংরক্ষণের হিড়িকের পর থেকে বাধ্য হয়ে শিকার ছাড়লেও জঙ্গলের মোহ কাটাতে পারেননি।

সাধুবাবার নির্দেশ অব্যর্থ। আধঘণ্টা অনুসন্ধানের পরেই একটা নালা পড়ল আর নালা পেরিয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যেই যেমন বর্ণনা ঠিক তেমনি একটা বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া নিম গাছের গুঁড়ি থেকে সাত পা দক্ষিণে চক্রপর্ণের সন্ধান মিলল। কোমর অবধি উঁচু গাছ, আধুলির সাইজের গোল পাতাগুলির মাঝখানে একটি করে গোলাপী চাকতি।

'এ কোথায় এলাম মশাই ?' প্রদ্যোতবাবু মন্তব্য করলেন।

'কেন, কী হল ?'

'এখানের অধিকাংশ গাছই দেখছি অচেনা,' বললেন প্রদ্যোতবাবু !'—আর জায়গাটা কী রকম স্যাঁৎসেঁতে দেখছেন ? বনের বাকি অংশের সঙ্গে যেন কোনো মিলই নেই।'

পায়ের তলায় ভিজে ভিজে ঠেকছিল বটে তুলসীবাবুর, কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে কেন ? কলকাতা শহরের মধ্যে এ পাড়া ও পাড়ায় তাপমাত্রার ফারাক হয়—যেমন ভবানীপুরের চেয়ে টালিগঞ্জে শীত বেশি। তাহলে বনের এক অংশ থেকে আরেক অংশে তফাত হবে না কেন ? এতো প্রকৃতির খেয়াল।

তুলসীবাবু কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে গাছের দিকে উপুড় হয়েছেন, এমন সময় প্রদ্যোতবাবুর বিস্ময়সূচক প্রশ্ন তাঁকে বাধা দিল।

'ওটা আবার কী ?'

তুলসীবাবু দেখেছেন জিনিসটা, কিন্তু গ্রাহ্য করেননি। বললেন, 'কিছুর ডিমটিম হবে আর কী !'

প্রদ্যোতবাবুর প্রথমে পাথর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই বুঝলেন ডিম ছাড়া আর কিছুই না। হলুদের উপর চকোলেটের ডোরা। তারই ফাঁকে ফাঁকে নীলের ছিটেফোঁটা। এত বড় ডিম কিসের হতে পারে ? ময়াল

সাপ-টাপ নয় তো ?

ইতিমধ্যে তুলসীবাবু গাছের খানিকটা তাঁর ঝোলায় পুরে নিয়েছেন। ডাল সমেত আরো কিছু পাতা নেবার ইচ্ছে ছিল ; কিন্তু সেটা হল না। ডিম বাবাজী ঠিক এই সময়ই ফুটবেন বলে মনস্থ করলেন।

খোলা চৌচির হবার শব্দটা শুনে প্রদ্যোতবাবু চমকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, ডিম ফুটেছে, এবং শাবকের মাথা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সাপ নয়, কুমীর নয়, কচ্ছপ নয়—পাখি।

এবার ছানার সমস্ত শরীরটা বেরিয়ে এসে দুটি শীর্ণ ঠ্যাঙে ভর করে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে। আয়তন ডিমেরই অনুযায়ী ; শাবক অবস্থাতেও দিব্যি একটা মুরগীর সমান বড়। প্রদ্যোতবাবুর এককালে নিউ মার্কেটে পাখির সন্ধানে যাতায়াত ছিল। বাড়িতে পোষা বুলবুলি আছে, ময়না আছে। কিন্তু এত বড় ঠোঁট, এত লম্বা পা, গায়ের এমন বেগুনী রংআর জন্মানোমাত্র এমন সপ্রতিভ ভাব তিনি কোনো পাখির মধ্যে দেখেননি।

তুলসীবাবুর কিন্তু ছানা সম্বন্ধে মনে কোনো কৌতূহল নেই। তিনি ইতিমধ্যে গাছের আরো বেশ খানিকটা অংশ ঝোলায় পুরে ফেলেছেন।

প্রদ্যোতবাবু এদিক ওদিক চেয়ে পাখিটা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য না করে পারলেন না।

'আশ্চর্য ! ছানা আছে অথচ মা নেই, বাপ নেই। অন্তত কাছাকাছির মধ্যে তো দেখছি না।'

'ঢের আশ্চর্য হয়েছেন' ঝোলা কাঁধে নিয়ে বললেন তুলসীবাবু।—'তিনটে বাজে, এর পর ঝপ করে সন্ধে হয়ে যাবে।'

প্রদ্যোতবাবু কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পাখি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে তুলসীবাবুর সঙ্গে হাঁটা শুরু করলেন। তাঁদের গাড়ি অপেক্ষা করছে যেখানে, সেখানে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় আধ ঘণ্টা।

পিছন থেকে শুকনো পাতার খসখসানি শুনে প্রদ্যোতবাবুই থেমে ঘাড় ঘোরালেন।

ছানাটা পিছু নিয়েছে।

'ও মশাই !'

এবার তুলসীবাবুও থেমে পিছন ফিরলেন। শাবকের দৃষ্টি সটান তুলসীবাবুর দিকেই।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে ছানাটা তুলসীবাবুর সামনেই থামল। তারপর গলা বাড়িয়ে তার বেমানান রকম বড় ঠোঁট দিয়ে তুলসীবাবুর ধুতির কোঁচার

একটা অংশে কামড়ে দিয়ে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

প্রদ্যোতবাবু কাণ্ড দেখে এতই অবাক যে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। শেষটায় যখন দেখলেন যে তুলসীবাবু ছানাটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঝোলায় পুরলেন, তখন আর চুপ থাকা যায় না।

'কী করছেন মশাই! একটা নামগোত্রহীন ধেড়ে পাখির ছানাকে থলেতে পুরে ফেললেন?'

'একটা কিছু পোষার শখ ছিল অনেকদিন থেকে,' আবার হাঁটতে শুরু করে বললেন তুলসীবাবু। —'নেড়ীকুত্তা পোষে লোকে দেখেননি? তাদের গোত্রটা কি খুব একটা জাহির করার ব্যাপার?'

প্রদ্যোতবাবু দেখলেন পাখির ছানাটা তুলসীবাবুর দোলায়মান ঝোলাটা থেকে গলা বার করে মিটিমিটি এদিক ওদিকে চাইছে।

তুলসীবাবু থাকেন মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে দোতলার একটি ফ্ল্যাটে। একা মানুষ, একটি চাকর আছে, নাম নটবর, আর জয়কেষ্ট বলে একটি রান্নার লোক। দোতালায় আরো একটি ফ্ল্যাট আছে। তাতে থাকেন নবরত্ন প্রেসের মালিক তড়িৎ সান্যাল। সান্যাল মশাইয়ের মেজাজ এমনিতেই খিটখিটে, তার উপর লোড শেডিং-এ ছাপাখানাতে বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে বলে সব সময়ই যেন মারমুখো ভাব।

দু' মাস হল তুলসীবাবু দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে পাখির ছানাটিও এসেছে, আর আসার পর দিনই একটি তারের খাঁচা কিনে পাখিটিকে তার মধ্যে পুরে বারান্দার এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে। পাখির নামকরণও হয়েছে। তুলসীবাবু ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলেন, তাই সংস্কৃত নামের উপর তাঁর একটা দুর্বলতা আছে। নাম রেখেছিলেন বৃহচ্চঞ্চু; শেষ পর্যন্ত সেটা চঞ্চুতে এসে দাঁড়িয়েছে।

জগদলপুরে থাকতে পাখিকে ছোলা ছাতু পাউরুটি খাওয়াবার চেষ্টা করে তুলসীবাবু শেষে বুঝেছিলেন যে পাখিটি মাংসাশী। তার পর থেকে রোজ উচ্চিংড়ে আরশোলা ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে তাকে। সম্প্রতি যেন তাতে পাখির খিদে মিটছিল না। খাঁচার জালের উপর দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট চালিয়ে খড়াং খড়াং শব্দ তুলে তার ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছিল। শেষটায় বাজার থেকে মাংস কিনে এনে খাওয়াতে শুরু করে তুলসীবাবু তার খিদে মিটিয়েছেন। এখন নিয়মিত মাংস কিনে আনে নটবর, আর সেই মাংস খেয়েই বোধহয় পাখির আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুলসীবাবু গোড়াতেই বুদ্ধি করে পাখির অনুপাতে খাঁচাটা বড়ই কিনেছিলেন। তাঁর মন বলেছিল এ পাখির জাত বেশ জাঁদরেল। খাঁচাটা মাথায় ছিল আড়াইফুট। কালই ভদ্রলোক লক্ষ করেছেন যে চঞ্চু সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার মাথা তারে ঠেকে যাচ্ছে। অথচ বয়স মাত্র দু'মাস। এইবেলা চটপট একটা বড় খাঁচার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

ভালো কথা—পাখির ডাক সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। এই ডাক শুনেই একদিন সকালে সান্যাল মশাই বারান্দার ওপারে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলেন। এমনিতে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাক্যালাপ নেই বললেই চলে; আজ কোনোমতে কাশির ধাক্কা সামলে নিয়ে তড়িৎ সান্যাল তুলসীবাবুর উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, —'খাঁচায় কী জানোয়ার রেখেছেন মশাই যে, ডাক ছাড়লে পিলে চমকে যায়?' পাখির ডাক শুনে জানোয়ারের কথাই মনে হয় তাতে ভুল নেই।

তুলসীবাবু সবে কলঘর থেকে বেরিয়ে অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন; হাঁক শুনে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তড়িৎবাবুকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'জানোয়ার নয়, পাখি। আর ডাক যেমনই হোক না কেন, আপনার হুলোরমতো রাত্তিরে ঘুমের ব্যাঘাত করে না।'

হুলোর কান্না আগে শোনা যেত না, সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

তুলসীবাবুর পালটা জবাবে বাক্‌যুদ্ধ আর এগোতে পারল না বটে, কিন্তু তড়িৎবাবুর গজগজানি থামল না। ভাগ্যিস খাঁচাটা থাকে তড়িৎবাবুর গণ্ডীর বাইরে; পাখির চেহারা দেখলে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া কী হত বলা শক্ত।

এই চেহারা তুলসীবাবুকে বিস্মিত না করলেও, তাঁর বন্ধু প্রদ্যোতবাবুকে করে বৈকি। আগে অফিসের বাইরে দুজনের মধ্যে দেখা কমই হত। মনসুরের দোকানে গিয়ে কাবাব পরোটা খাওয়াটা ছিল সপ্তাহে একদিনের ব্যাপার। প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে বাপ মা ভাই বোন আছে, সংসারের অনেক দায়দায়িত্ব আছে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য থেকে ফেরার পর থেকেই তাঁর মনটা বার বার চলে যায় তুলসীবাবুর পাখির দিকে। ফলে তিনি আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যায় চলে আসেন মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে।

পাখির দ্রুত আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে তার চেহারার পরিবর্তনও প্রদ্যোতবাবুকে বিস্মিত করে। এটা তুলসীবাবুর দৃষ্টি এড়ায় কী করে, বা না এড়ালেও তিনি এই নিয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন না কেন, সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। কোনো পাখির চোখের চাহনি যে এত নির্মম হতে পারে সেটা প্রদ্যোতবাবু ভাবতে পারেননি। চোখ দুটো হলদে, আর সেই চোখে এক ভাবে একই দিকে মিনিটের পর মিনিট চেয়ে থাকাটা তাঁর ভারী অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। পাখির দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটিও স্বভাবতই বেড়ে চলেছে। কুচকুচে কালো মসৃণ ঠোঁট, ইঙ্গলের ঠোঁটের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তবে আয়তনে প্রায় তিন গুণ বড়। এ পাখি

যে ওড়ে না সেটা যেমন ডানার সাইজ থেকে বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাঘেরমতো নখ সমেত শক্ত, সবল পা দুটো থেকে। অনেক পরিচিত লোকের কাছে পাখির বর্ণনা দিয়েছেন প্রদ্যোতবাবু, কিন্তু কেউই চিনতে পারেনি।

আজ রবিবার, এক ভাইপোর একটি ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন প্রদ্যোতবাবু। খাঁচার ভিতর আলো কম, তাই ফ্ল্যাশের প্রয়োজন। ছবি তোলার অভ্যাস ছিল এককালে। তারই উপর ভরসা করে খাঁচার দিকে তাগ করে ক্যামেরার শাটারটা টিপে দিলেন প্রদ্যোতবাবু। ফ্ল্যাশের চমকের সঙ্গে সঙ্গে পাখির আপত্তিসূচক চিৎকারে তাঁকে তিন হাত পেছিয়ে যেতে হল, আর সেই মুহূর্তেই মনে হল যে এর গলার স্বরটা রেকর্ড করে রাখা উচিত। উদ্দেশ্য আর কিছুই না—ছবি দেখিয়ে এবং ডাক শুনিয়ে যদি পাখিটাকে চেনাতে সুবিধে হয়। তাছাড়া প্রদ্যোতবাবুর মনে একটা খচখচানি রয়ে গেছে যেটা তুলসীবাবুর কাছে এখনো প্রকাশ করেননি ; কবে বা কোথায় মনে পড়ছে না, কিন্তু কোনো বই বা পত্রিকায় প্রদ্যোতবাবু একটি পাখির ছবি দেখেছেন যেটার সঙ্গে তুলসীবাবুর পাখির আশ্চর্য সাদৃশ্য। যদি কখনো সেই ছাপা ছবি আবার হাতে পড়ে তাহলে মিলিয়ে দেখতে সুবিধা হবে।

ছবি তোলার পরে চা খেতে খেতে তুলসীবাবু একটা কথা বললেন যেটা আগে বলেননি। চঞ্চু আসার কিছুদিন পর থেকেই নাকি এ বাড়িতে আর কাক-চড়ুই বসে না। 'খুব লাভ হয়েছে মশাই,' বললেন তুলসীবাবু, 'চড়ুইগুলো যেখানে-সেখানে বাসা করে উৎপাত করত। কাকে রান্নাঘর থেকে এটা-সেটা সরিয়ে নিত। আজকাল ওসব বন্ধ।'

'সত্যি বলছেন ?' —প্রদ্যোতবাবু যথারীতি অবাক।

'এই যে রইলেন এতক্ষণ, দেখলেন একটাও অন্য কোনো পাখি ?'

প্রদ্যোতবাবুর খেয়াল হল যে সত্যিই দেখেননি। 'কিন্তু আপনার চাকরবাকর টিকে আছে ? চঞ্চুবাবাজীকে বরদাস্ত করতে পারে তো ?'

'জয়কেষ্ট খাঁচার দিকে এগোয়-টেগোয় না,' বললেন তুলসীবাবু, 'তবে নটবর চিমটে করে মাংসের টুকরো ঢুকিয়ে দেয়। তার আপত্তি থাকলেও সে মুখে প্রকাশ করেনি। আর পাখি যদি দুষ্টুমি করেও, আমি একবারটি গিয়ে দাঁড়ালেই সে বশ মেনে যায়।—ইয়ে, আপনি ছবি তুললেন কী কারণে !'

প্রদ্যোতবাবু আসলে কারণটা চেপে গেলেন। বললেন, 'কোন্‌দিন মরে-টরে যাবে, একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা ভালো নয় কি ?'

প্রদ্যোতবাবুর ছবি প্রিন্ট হয়ে এল পরদিনই। তার মধ্যে থেকে ভালোটা নিয়ে দুটো এনলার্জমেন্ট করিয়ে একটা আপিসে তুলসীবাবুকে দিলেন, অন্যটা নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন মালেন স্ট্রীটে পক্ষিবিদ্ রণজয় সোমের বাড়ি। সম্প্রতি দেশ

পত্রিকায় সিকিমের পাখি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন সোম সাহেব।

কিন্তু তিনি পাখির ছবি দেখে চিনতে পারলেন না। কোথায় পাখিটা দেখা যায় জিগ্যেস করাতে প্রদ্যোতবাবু অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বললেন। —'ছবিটা ওসাকা থেকে আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছে। সেও নাকি পাখির নাম জানে না।'

তারিখটা ডায়রিতে নোট করে রাখলেন তুলসীবাবু। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। গত মাসেই কেনা সাড়ে চার ফুট উঁচু নতুন খাঁচায় রাখা সাড়ে তিন ফুট উঁচু পোষা পাখি বৃহচ্চঞ্চু গতকাল মাঝরাত্রে একটা কাণ্ড করে বসেছে।

একটা সন্দেহজনক শব্দে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল তুলসীবাবুর। কট্‌কট্ কটাং কটাং কট্‌কট্···। ঘুম ভাঙার মিনিট খানেকের মধ্যে শব্দটা থেমে গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ।

মন থেকে সন্দেহটা গেল না। তুলসীবাবু মশারিটা তুলে খাট থেকে নেমে পড়লেন। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। তারই আলোতে চটিজোড়ায় পা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

টর্চের আলো খাঁচাটার উপর পড়তেই দেখলেন নতুন খাঁচার মজবুত তার ছিঁড়ে দিব্যি একটা বেরোনোর পথ তৈরি হয়ে গেছে।

খাঁচা অবিশ্যি খালি।

টর্চের আলো ঘুরে গেল বারান্দার উল্টো দিকে। চঞ্চু নেই।

সামনে সিঁড়ির মুখটাতে বারান্দা ডাইনে ঘুরে চলে গেছে তড়িৎবাবুর ঘরের দিকে। একটা শব্দ—

তুলসীবাবু রুদ্ধশ্বাসে বারান্দার মোড়ে গিয়ে আলো ফেললেন বিপরীত দিকে।

যা ভেবেছিলেন তাই। তড়িৎবাবুর হুলো চঞ্চুর ডাকসাইটে ঠোঁটের মধ্যে অসহায় বন্দী। মেঝেতে টর্চের আলোয় যেটা চিক্‌চিক করছে সেটা রক্ত ছাড়া আর কিছুই না। তবে হুলোটা এখনো জ্যান্ত সেটা তার চার পায়ের ছটফটানি থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে আলো চোখে পড়া এবং তুলসীবাবু ধমকের সুরে 'চঞ্চু' বলার সঙ্গে সঙ্গে পাখি ঠোঁট ফাঁক করে হুলোটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বড় বড় পা ফেলে ও-মাথা থেকে এ-মাথা এসে মোড় ঘুরে সটান গিয়ে ঢুকলো নিজের খাঁচার ভিতর।

এই বিভীষিকার মধ্যে তুলসীবাবু হাঁফ না ছেড়ে পারলেন না।

তড়িৎবাবুর ঘরের দরজায় তালা। সারা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি স্কুলপাঠ্য বই ছাপানোর ঝামেলা মিটিয়ে ভদ্রলোক দিন তিনেক হল চলে গেছেন কলকাতার বাইরে বিশ্রামের জন্য।

ছলোটাকে ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত। কত গাড়ি যায় রাতবিরেতে রাস্তা দিয়ে—কলকাতা শহরে দিনে রাতে কত কুকুর বেড়াল গাড়ি চাপা পড়ে মরে তার কি কোনো হিসেব আছে ?

বাকি রাতটা ঘুম হল না তুলসীবাবুর।

পরদিন আপিস থেকে ঘন্টা খানেকের ছুটি নিয়ে রেলওয়ে বুকিং আপিসে গেলেন। একজন চেনা লোক ছিল কেরানিদের মধ্যে, তাই কাজ হাসিল হতে

বেশি সময় লাগল না। প্রদ্যোতবাবু একবার জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনার চঞ্চুর খবর কী মশাই ? তাতে তুলসীবাবু ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিলেন—'ভালোই'। তারপর এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছিলেন, 'আপনার দেওয়া ছবিটা ভাবছি বাঁধিয়ে রাখব।'

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তুলসীবাবু দ্বিতীয়বার বিজয়নগরম হয়ে জগদলপুর হাজির হলেন। সঙ্গে ব্রেকভ্যানে এল একটা প্যাকিং কেস, যার গায়ে ফুটো থাকায় তার ভিতরের খাঁচার পাখির নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো অসুবিধা হয়নি।

জগদলপুর থেকে একটি টেম্পো ভাড়া করে সঙ্গে দুজন কুলি নিয়ে তুলসীবাবু রওনা দিলেন দণ্ডকারণ্যের সেই জঙ্গলের সেই বিশেষ জায়গাটির উদ্দেশে, যেখানে চঞ্চুকে শাবক অবস্থায় পেয়েছিলেন তিনি।

চেনা জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে কুলির মাথায় বাক্স চাপিয়ে আধঘন্টার পথ হেঁটে সেই ঝলসানো নিম গাছের ধারে গিয়ে তুলসীবাবু থামলেন। কুলিরাও মাথা থেকে বাক্স নামাল। তাদের আগে থেকেই ভালো বকশিশ দেওয়া ছিল, আর বলা ছিল যে প্যাকিং কেসটা তাদের খুলতে হবে।

পেরেক খুলে কাঠ চিরে ফেলে খাঁচা বাইরে বার করার পর তুলসীবাবু দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে পাখি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। এ হেন জীবের দর্শন পেয়ে কুলি দুটো স্বভাবতই পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে পালাল। কিন্তু তাতে তুলসীবাবুর কোনো উদ্বেগ নেই। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। খাঁচার ভিতর চঞ্চু একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। তার মাথা এখন সাড়ে চার ফুট উঁচু, খাঁচার ছাত ছুঁইছুঁই করছে।

'আসি রে চঞ্চু !'

আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। তুলসীবাবু একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টেম্পোর উদ্দেশে রওনা দিলেন।

তুলসীবাবু কোথায় যাচ্ছেন সেটা আপিসে কাউকে বলে যাননি। এমনকি প্রদ্যোতবাবুকেও না। পাওনা থেকে পাঁচদিন ছুটি নিয়ে মাঝ সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ে সোমবার আবার আপিসে হাজিরা দেবার পর প্রদ্যোতবাবু স্বভাবতই জিগ্যেস করলেন এই অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কারণ। তুলসীবাবু সংক্ষেপে জানালেন নৈহাটিতে তাঁর এক ভাগনীর বিয়ে ছিল।

এর দিন পনেরো পরে প্রদ্যোতবাবু একদিন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খাঁচা সমেত পাখি উধাও দেখে ভারী অবাক হলেন। জিগ্যেস করে উত্তর পেলেন, 'পাখি আর নেই।'

প্রদ্যোতবাবুর মনটা খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। তিনি নেহাতই হাল্‌কা ভাবে বলেছিলেন পাখি মরে যাবার কথা ; এভাবে এত অল্প দিনের মধ্যেই কথাটা ফলে

যাবে সেটা ভাবতে পারেননি। দেয়ালে তাঁরই তোলা চঞ্চুর ছবি টাঙানো রয়েছে; তুলসীবাবুরও কেমন জানি নিক্ষুম ভাব—সব মিলিয়ে প্রদ্যোতবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদি বন্ধুর মনে কিছুটা ফুর্তি আনা যায় তাই বললেন, 'অনেকদিন মনসুরে যাওয়া হয়নি মশাই। চলুন কাবাব খেয়ে আসি।'

'ওসবে আর রুচি নেই,' বললেন তুলসীবাবু।

প্রদ্যোতবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।—'সে কি মশাই, কাবাবে অরুচি? আপনার কি শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি? আপনার তো এতরকম ওষুধ জানা আছে—একটা কিছু খান!—সেই সাধু যে পাতার সন্ধান দিল, তাতে ফল হয় কিনা দেখেছেন?'

তুলসীবাবু জানালেন সেই পাতার রস খাবার পর থেকে তাঁর রক্তের চাপ একদম স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটা আর বললেন না যে যদ্দিন পাখি ছিল তদ্দিন চক্রপর্ণের গুণ পরীক্ষা করার কথা তাঁর মনেই আসেনি। এই সবে দিন দশেক হল তিনি আবার কবিরাজীতে মন দিয়েছেন।

'ভালো কথা,' বললেন প্রদ্যোতবাবু, 'চক্রপর্ণ বলতে মনে পড়ল—আজ কাগজে দণ্ডকারণ্যের খবরটা পড়েছেন?'

'কী খবর?'

তুলসীবাবু কাগজ রাখেন, কিন্তু সামনের পাতার বেশি আর এগোনো হয় না। কাগজটা হাতের কাছেই টেবিলের উপর ছিল। প্রদ্যোতবাবু খবরটা বার করে দিলেন। বেশ বড় হরফেই শিরোনামা রয়েছে—'দণ্ডকারণ্যের বিভীষিকা।'

খবরে বলছে গত দশ দিন ধরে দণ্ডকারণ্যের আশেপাশে অবস্থিত গ্রাম থেকে নানারকম গৃহপালিত পশু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি কোনো এক জানোয়ারের খাদ্যে পরিণত হতে শুরু করেছে। দণ্ডকারণ্যে বাঘের সংখ্যা কমই, আর এ যে বাঘের কীর্তি নয় তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাঘ খাদ্য টেনে নিয়ে যায়; এ জানোয়ার তা করে না। তাছাড়া আধ-খাওয়া গরু-বাছুর ইত্যাদি দেখে বাঘের কামড়ের সঙ্গে এ জানোয়ারের কামড়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। মধ্য প্রদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত দু'জন বাঘা শিকারী এক সপ্তাহ অনুসন্ধান করেও এমন কোনো জানোয়ারের সন্ধান পাননি যার পক্ষে এমন হিংস্র আচরণ সম্ভব। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একজন গ্রামবাসী দাবী করে সে নাকি একরাত্রে তার গোয়াল থেকে একটি দ্বিপদবিশিষ্ট জীবকে ঝড়ের বেগে পালাতে দেখেছে। তারপরই সে তার গোয়ালে গিয়ে তার মহিষকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। মহিষের তলপেটের বেশ খানিকটা অংশ নাকি খুবলে নেওয়া হয়েছিল।

তুলসীবাবু খবর পড়ে কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলের উপর রেখে

দিলেন।

'এটাও কি আপনার কাছে অবাক কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না?' প্রদ্যোতবাবু প্রশ্ন করলেন।

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তিনি বিস্মিত হননি।

এর তিনদিন পর প্রদ্যোতবাবুর জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

সকালে চায়ের কাপ এনে সামনে রাখলেন গিন্নী, সঙ্গে প্লেটে নতুন প্যাকেট থেকে বার করা তিনখানা ডাইজেসটিভ বিস্কুট। সেদিকে চোখ পড়তেই প্রদ্যোতবাবু হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আর তার পরেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

মিনিবাসে করে একডালিয়া রোডে তাঁর কলেজের বন্ধু অনিমেষের কাছে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর নাড়ী চঞ্চল।

বন্ধুর হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পাশে ফেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'তোর রীডার্স ডাইজেস্টগুলো কোথায় চট করে বল—বিশেষ দরকার।'

অন্য অনেকের মতোই অনিমেষ সরকারের প্রিয় পাঠ্য পুস্তক হল রীডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকা। বন্ধুর আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করারও সময় পেলেন না তিনি। উঠে গিয়ে বুকশেলফের তলার তাক থেকে এক গোছা পত্রিকা বার করলেন টেনে।

'কোন মাসেরটা চাচ্ছিস?'

ঝড়ের বেগে এ সংখ্যা ও সংখ্যা উলটে দেখে অবশেষে যা খুঁজছিলেন তা পেলেন প্রদ্যোতবাবু।

'এই চেহারা—এগজ্যাক্টলি!'

একটি পাখির ছবির উপর আঙুল রেখেছেন প্রদ্যোতবাবু। জ্যান্ত পাখি নয়। শিকাগো ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে রাখা একটি পাখির আনুমানিক মূর্তি। হাতে বুরুশ নিয়ে মূর্তিটাকে পরিষ্কার করছে মিউজিয়ামের এক কর্মচারী।

'অ্যাণ্ড্যালগ্যালর্নিস,' নামটা পড়ে বললেন প্রদ্যোতবাবু। 'অর্থাৎ টেরর বার্ড—ভয়াল পাখি। আয়তন বিশাল, মাংসাশী, ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী, আর অসম্ভব হিংস্র।'

প্রদ্যোতবাবুর মনে যে সন্দেহটা উঁকি দিয়েছিল সেটা সত্যি বলে প্রমাণ হল যখন পরদিন তুলসীবাবু আপিসে এসে বললেন যে তাঁকে আরেকবারটি দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, এবং তিনি খুব খুশি হবেন যদি প্রদ্যোতবাবু তাঁর সঙ্গে যান। হাতিয়ার সমেত। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া মুশকিল হতে পারে, কিন্তু তাতে পেছপা হলে চলবে না, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।

প্রদ্যোতবাবু রাজী হয়ে গেলেন।

অ্যাডভেঞ্চারের উৎসাহে দুই বন্ধু ট্রেনযাত্রার গ্লানি অনুভব করলেন না। প্রদ্যোৎবাবু যে রীডার্স ডাইজেস্টে পাখিটার কথা পড়েছেন সেটা আর বললেন না ; সেটা বলার সময় ঢের আছে। তুলসীবাবু সবই বলে দিয়েছেন তাঁকে, আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহস্য করেছেন এটাও বলে যে পাখিকে মারার প্রয়োজন হবে বলে তিনি মনে করেন না, বন্দুক নিতে বলেছেন শুধু সাবধান হবার জন্য। প্রদ্যোতবাবু বন্ধুর কথায় কান দেননি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে এটা তিনি স্থির করে নিয়েছেন। গত রবিবারের কাগজে খবর বেরিয়েছে যে এই নৃশংস প্রাণীকে যে হত্যা করতে পারবে, মধ্য প্রদেশ সরকার তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। এই প্রাণী এখন নরখাদকের পর্যায়ে এসে পড়েছে ; একটি কাঠুরের ছেলে সম্প্রতি তার শিকারে পরিণত হয়েছে।

জগদলপুরে পৌঁছে বনবিভাগের কর্তা মিঃ তিরুমালাইয়ের সঙ্গে কথা বলে শিকারের অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না। তবে তিরুমালাই সতর্ক করে দিলেন যে স্থানীয় কোনো লোককে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যাবে না। কোনো লোকই ওই বনের ত্রিসীমানায় যেতে রাজী হচ্ছে না।

প্রদ্যোতবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর যে-সব শিকারী আগে গেছে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা গেছে কি ?'

তিরুমালাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ পর্যন্ত চারজন শিকারী প্রাণীটির সন্ধানে গিয়েছিল। প্রথম তিনজন বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। চতুর্থজন ফেরেনি।'

'ফেরেনি ?'

'না। তারপর থেকে আর কেউ যেতে চাচ্ছে না। আপনারাও যাবেন কিনা সেটা ভালো করে ভেবে দেখুন।'

প্রদ্যোতবাবুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তুলসীবাবুর শান্ত ভাব দেখে তিনি জোর করে মনে সাহস ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, 'আমরা তাও যাব।'

এবারে হাঁটতে হল আরো বেশি, কারণ ট্যাক্সিওয়ালা মেন রোড ছেড়ে বনের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যেতে রাজী হল না। তুলসীবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে ; পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দেওয়া হবে শুনে ট্যাক্সি সেই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করতে রাজী হল। দুই বন্ধু গাড়ি থেকে নেমে বনের সেই বিশেষ অংশটির উদ্দেশে রওনা দিলেন।

বসন্তকাল, তাই বনের চেহারা বদলে গেছে, গাছপালা সবই ঋতুর নিয়ম মেনে চলছে। কচি সবুজে চারদিক ছেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে পাখির ডাক

একেবারেই নেই। কোয়েল দোয়েল পাপিয়া ইত্যাদি কবিদের একচেটিয়া বসন্তের পাখি সব গেল কোথায় ?

তুলসীবাবুর কাঁধে এবারও তাঁর ঝোলা। তাতে একটি খবরের কাগজের মোড়ক রয়েছে সেটা প্রদ্যোতবাবু জানেন, যদিও তাতে কী আছে জানেন না। তুলসীবাবু ভোরে উঠে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন সেটা জিগ্যেস করা হয়নি। প্রদ্যোতবাবুর নিজের সঙ্গে রয়েছে তাঁর বন্দুক ও টোটা।

গতবারের তুলনায় আগাছা কম থাকাতে বনের মধ্যে দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে। তাই একটা দেবদারু গাছের পিছনে উপুড় হওয়া পা ছড়ানো মানুষের দেহটাকে বেশ দূর থেকেই দেখতে পেলেন প্রদ্যোতবাবু। তুলসীবাবু দেখেননি। প্রদ্যোতবাবু থেমে ইসারা করায় তাঁকেও থামতে হল।

প্রদ্যোতবাবু বন্দুকটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন দেহটার দিকে। তুলসীবাবুর ভাব দেখে মনে হল এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কৌতূহল নেই।

অর্ধেক পথ গিয়ে প্রদ্যোতবাবু ফিরে এলেন।

'আপনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে মশাই', বললেন তুলসীবাবু, 'এ তো সেই চতুর্থ শিকারী ?'

'তাই হবে,' ধরা গলায় বললেন প্রদ্যোতবাবু, 'তবে লাশ সনাক্ত করা মুশকিল হবে। মুণ্ডুটাই নেই।'

বাকি পথটা দুজনে কেউই কথা বললেন না।

সেই নিম গাছটার কাছে পৌঁছাতে লাগল এক ঘণ্টা, অর্থাৎ মাইল তিনেক হাঁটতে হয়েছে। প্রদ্যোতবাবু দেখলেন চক্রপর্ণের গাছটা ডালপাতা গজিয়ে আবার আগের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'চঞ্চু ! চঞ্চু !'

প্রদ্যোতবাবুর এই সংকট মুহূর্তেও হাসি পেল। কিন্তু তার পরেই মনে হল তুলসীবাবুর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। এই রাক্ষুসে পাখি যে তাঁর পোষ মেনেছিল সেটা তো তিনি নিজেই দেখেছেন।

বনের পুবদিকে পাহাড় থেকে বার বার তুলসীবাবুর ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'চঞ্চু ! চঞ্চু ! চঞ্চু !'

মিনিট পাঁচেক ডাকার পর প্রদ্যোতবাবু দেখলেন যে বেশ দূরে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা কী যেন তাঁদেরই দিকে এগিয়ে আসছে, এবং এতই দ্রুত গতিতে যে তার আয়তন প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে।

এবার আর সন্দেহের কোনো কারণ নেই। ইনিই সেই ভয়াল পাখি।

প্রদ্যোতবাবু অনুভব করলেন তাঁর হাতের বন্দুকটা হঠাৎ যেন ভারী বলে মনে

হচ্ছে। প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করতে পারবেন কি ?

চঞ্চু গতি কমিয়ে একটা ঝোপ ভেদ করে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল।

অ্যাণ্ড্যালগ্যালর্নিস। নামটা মনে থাকবে প্রদ্যোতবাবুর। মানুষের সমান উঁচু পাখি। উটপাখিও লম্বা হয়, তবে সেটা প্রধানত তার গলার জন্য। এ পাখির পিঠই তুলসীবাবুর মাথা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ একমাসে পাখি উচ্চতায় বেড়েছে প্রায় দেড় ফুট। গায়ের রঙও বদলেছে। বেগুনীর উপর কালোর ছোপ ধরেছে। আর জলন্ত হলুদ চোখের ওই দৃষ্টি পাখির খাঁচাবন্দী অবস্থায় প্রদ্যোতবাবুর সহ্য করতে অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এখন সে-চোখের দিকে চাওয়া যায় না ; পাখির দৃষ্টি সটান তার প্রাক্তন মালিকের দিকে।

পাখি কী করবে জানা নেই। তার স্থির নিশ্চল ভাব আক্রমণের আগের অবস্থা

হতে পারে মনে করেই বোধ হয় প্রদ্যোতবাবুর কাঁপা হাতে ধরা বন্দুকটা খানিকটা উঁচিয়ে উঠেছিল। ওঠামাত্র পাখির দৃষ্টি বন্দুকের দিকে ঘুরল আর তার পরমুহূর্তেই প্রদ্যোতবাবু শিউরে উঠলেন দেখে যে পাখির গায়ের প্রত্যেকটি পালক উঁচিয়ে উঠে তার আকৃতি আরো শতগুণে ভয়াবহ করে তুলেছে।

'ওটা নামিয়ে ফেলুন,' চাপা ধমকের সুরে বললেন তুলসীবাবু।

প্রদ্যোতবাবুর হাত নেমে এল, আর সেই সঙ্গে পাখির পালকও নেমে এল। তার দৃষ্টিও আবার ঘুরে গেল তুলসীবাবুর দিকে।

'তোর পেটে জায়গা আছে কিনা জানি না, তবে আমি দিচ্ছি বলে যদি খাস।'

তুলসীবাবু ঝোলা থেকে ঠোঙাটা আগেই বার করেছিলেন, এবার তাতে একটা ঝাঁকুনি দেওয়াতে একটি বেশ বড় মাংসের খণ্ড ছিটকে বেরিয়ে পাখিটার সামনে গিয়ে পড়ল।

'অনেক লজ্জা দিয়েছিস আমাকে, আর দিসনি।'

প্রদ্যোতবাবু অবাক হয়ে দেখলেন যে পাখিটা ঘাড় নিচু করে ঠোঁট দিয়ে মাটি থেকে মাংসখণ্ড তুলে নিয়ে তার মুখে পুরল।

'এবার সত্যিই গুডবাই।'

তুলসীবাবু ঘুরলেন। প্রদ্যোতবাবু চট্ করে পাখির দিকে পিঠ করার সাহস না পেয়ে কিছুক্ষণ পিছু হাঁটলেন। তারপর পাখি এগোচ্ছে না বা আক্রমণ করার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না দেখে ঘুরে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা শুরু করলেন।

দণ্ডকারণ্যের রাক্ষুসে প্রাণীর অত্যাচার রহস্যজনকভাবে থেমে যাবার খবর কাগজে বেরোল দিন সাতেক পরে। পাছে বিস্ময় প্রকাশ না করে রসভঙ্গ করেন, তাই প্রদ্যোতবাবু অ্যাণ্ড্যালগ্যালর্নিসের কথা, বা সে পাখি যে আজ ত্রিশ লক্ষ বছর হল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে কথা কিছুই বলেননি তুলসীবাবুকে। আজ খবরটা পড়ে আপিসে এসে তাঁকে আসতেই হল তাঁর বন্ধুর কাছে। বললেন, 'আমার মন বলছে আপনি এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন। আমি তো মশাই অথৈ জলে।'

'ব্যাপারটা কিছুই না,' কাজ বন্ধ না করেই বললেন তুলসীবাবু, 'মাংসের সঙ্গে ওষুধ মেশানো ছিল।'

'ওষুধ ?'

'চক্রপর্ণের রস,' বললেন তুলসীবাবু, 'আমিষ ছাড়ায়। যেমন আমাকে ছাড়িয়েছে।'